ইসলাম এবং কুসংস্কার-(৭ম খন্ড)

(নবী (সঃ) এর মল-মুত্র থেকে আতরের সুবাস)

সাঈদ কামরান মির্জা
ইউ এস এ
জুন ১২, ২০০৫

(পাঠকদের কাছে আমার অনুরোধ যে যারা আমার 'প্রথম খন্ড 'পাঠ করিয়াছেন তারা ইচ্ছে করলে 'ভূমিকাটি' স্কীপ করতে পারেন, কারণ এই ভূমিকা প্রত্যেক খন্ডেই যাবে এবং ভুমিকা একই থাকবে, যদিও দ্বিতীয় খন্ডে ভুমিকাটিকে কিছুটা পরিবর্তন এবং পরিবর্ধিত করা হয়েছে। অবশ্য যারা আমার প্রথম খন্ড পড়েন নাই, তাদের জন্য এই ভূমিকাটি অতি প্রয়োজনীয়। ক্রমাগত ভাবে প্রত্যেক খন্ডে সুধু ইসলামী কুসংস্কারগুলোর নতুন ক্রমিক নং হিসেবে আরও নতুন নতুন চমকপ্রদ সব আজগুবি ইসলামী কেচ্ছা-কাহিনী চলতে থাকবে।)

ভূমিকা

আমরা সবাই জানি যে কুসংস্কার হল কোন **popular belief held without any reason or logic**. অর্থাৎ কিনা কোন প্রমান বিহীন কথা যাহা সাধারনতঃ মুর্খরা অন্দ্ধভাবে বিশ্বাস করে থাকে। এই কুসংস্কার আবার দুই প্রকার হয়ে থাকে যেমন, রূপকথার **(Folklore)** কাহিনী যাহা কুসংস্কার হলেও তাকে লোককথা বা কেচ্ছা-কাহিনী হিসেবেই ধরা হয়। অন্যটি হল ধর্মীয় কুসংস্কার যাহা একটি অলৌকিক বিশ্বাসের উপর নিহিত থাকে। মুলতঃ অজানা ভয়, পরকালের চিন্তা এবং অলৌকিকতা থেকেই কুসংস্কারের জন্ম হয়। ব্যাপারটি আরও পরিস্কার করে বললে এটাই দাড়ায় যে মানুষের পরকালের অজানা ভয় এবং তা' থেকে সৃষ্ট অবাস্তব কুসংস্কার থেকেই জন্ম হয়েছে পৃথিবীর সকল ধর্ম। তাই দেখা যায় প্রায় সকল ধর্মের আসল উপাদানই **(Ingredients)** হল কিছু অবাস্তব কুসংস্কার। বিশ্বের প্রায় সবক'টি প্রধান ধর্মেই দেখা যায় অনেক কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস। এদিক থেকে বিচার করলে ইসলাম ধর্মে কুসংস্কার এর ছড়াছড়ি। ইসলাম ধর্মে এত বেশি কুসংস্কার পাওয়া যায় যে এই ধর্মটির মুল স্তম্ভটিই দাঁড়িয়ে আছে কিছু পৌরানিক এবং অলৌকিকতাপুর্ন কুসংস্কারের উপর।

ইসলামের মুল কিতাব কোরান এবং অসংখ্য হাদিস পড়লে এমন অনেক কুসংস্কারের সন্ধান পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস স্থাপন করেই সৃষ্টি হয় ধর্মীয় উম্মাদনা বা **fanatical believers** বা অন্ধবিশ্বাসীদের ধর্মীয় মাতম।

বাংলাদেশের বাজারের আনাচে-কানাচে খোজ করলে দেখা যায়, বাজারের বুক-স্টোর, ইসলামিষ্টদের লাইব্রেরী গুলোতে, এমনকি শহরের ফুটপাতেও

(ফাতেমোল্লার ফুট পাতের চাঁদ তাঁরা) এরুপ হাজার হাজার ইসলামী কিতাব পাওয়া যায় যেগুলোতে কুসংস্কার এ ভর্তি। এইসব ইসলামি কিতাবের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু বই যেমনঃ **বেহেশ্‌তের কুঞ্জি, বেহেশ্‌তী জেওর, মোকসেদুল মুমিনিন, কাছাছুল আম্বিয়া, নেয়ামুল কোরান ইত্যাদি প্রসিদ্ধ এবং জনপ্রিয়।** এইসব ইসলামী কিতাব বাংলা দেশের মত মুসলিম দেশে এত বেশি জনপ্রিয় যে পাবলিসার্শদেরকে ৩০-৪০টি সংস্করন বের করেও কুলোতে পারছেনা।

উপরোল্লিখিত কয়েকটি কিতাবের মধ্যে **'কাছাছুল আম্বিয়া'** সম্বন্ধে কিছু কথা বলা এখানে অতি প্রয়োজন মনে করছি। এই ইসলামী কিতাবটি অন্যসব ইসলামী কিতাব থেকে বেশ আলাদা ভাবে ধরা হয়। কারণ এই কিতাবটি কোন মোল্লা-মাওলানার নিজের মনগড়া কথায় ভর্তি নয়; এই কিতাবটির নাম **'কাছাছুল আম্বিয়া'** যার অর্থ দাড়ায়—**'নবীগনের জীবনী'**। এই বইটিতে আরবের বুকে যত নবী পয়দা হইয়াছে এবং যাহাদের নাম পবিত্র কোরানে এবং হাদিসে জায়গা পেয়েছে তাদেরই জীবন-কাহিনীতে ভর্তি। অর্থাৎ, এই কিতাবে যাহা লিখা আছে তাহা পবিত্র কোরান ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী রচিত হয়েছে এবং এই বইটির (আমি যে বইটি ব্যবহার কর্‌ছি) প্রনেতা একজন সুশিক্ষিত মুসলমান নাম তার— এম, এন, এম ইমদাদুল্লাহ (এম এ; বি এ (অনার্স); এম এ)। কিতাবটির আকৃতি এবং চেহারা একেবারে কোরানের ন্যায় এবং এর সম্মানও অনেক বেশি। লাইব্রেরী গুলোতে এবং ভক্তদের ঘরে একেবারে উপরের Shelf এ কোরানের ঠিক পাশেই তার স্থান হয়। বইটির দামও বেশ, বলতে গেলে একটি অনুবাদ কোরানের চেয়েও মুল্য অধিক। এই কিতাবের ৯০% কথাবার্তাই ভীষন কুসংস্কারে পুর্ন কেচ্ছা-কাহিনী স্থান পেয়েছে এবং এইসব আবেগ পুর্ন কেচ্ছা-কাহিনী—সাধারন বিশ্বাসী মুসলিমগন পড়ে ভক্তিতে গদগদ হয়ে আরওবেশি করে নামাজ-রোজাতে মনোনিবেশ করবে এবং যাদের বিশ্বাস হাল্কা বা বিশ্বাস নেই তারা এইসব আজগুবী কথা পড়ে হেসে চেয়ার থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যাবে বলেই আমার মনে হয়!

যা হউক, এসব কুসংস্কারপুর্ন ইসলামী কিতাব গুলো বাংলাদেশের ঘড়ে ঘড়ে পাওয়া যাবে এবং **এইসব কিতাবই হল বাংলাদেশের সাধারণ মুসলিম-আমজনতার আসল শিক্ষক বা গুরু।** ইসলাম ধর্মের অনেক শিক্ষাই এরা পেয়ে থাকে এইসব ইসলামী কিতাব থেকে। আর এইসব কিতাবের প্রভাবেই বাংলাদেশের মুসলিম-আমজনতার কাছে ধর্মীয় পীর-ফকির-দরবেশগন অতি প্রিয় হয় যে কারনে বাঙ্গালী মুসলিমদের মধ্যে পীরের ব্যবসা, তাবিজের ব্যবসা একেবারে রমরমা। কোন কোন স্বার্থান্বেষী মাওলানারা *(যেমন রাজাকার-মাওলানা সাঈদী)* আবার এসব আজগুবি কেচ্ছা-কাহিনী কাফেরদের তৈরী কেসেটে বন্দ্বি করে বাজারে দেদার বিক্রি করছে এবং কিছু কুসংস্কারপুর্ন মিথ্যা কথা বিক্রি করে সাধারণ গরীবের পকেট লুট করে নিচ্ছে। এসবই হচ্ছে ইসলামের নামে,আল্লাহর তায়ালার নামে!

বাংলাদেশের গাও-গ্রামে এমনকি আজকাল শহরেও অসংখ্য ইসলামি জলসা বা ওয়াজ-মাহফিল হয়ে থাকে যেখানে হাজার হজার সাধারণ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, কুশিক্ষিত, এমনকি অনেক শিক্ষিত বড় বড় ডিগ্রিধারী অন্ধবিশ্বাসী মুসলমানরাও মাওলানাদের ওয়াজ তন্ময় হয়ে শুনে থাকে। এইসব মাওলানাদের বক্তব্যে **বেশি অংশই থাকে কুসংস্কার পুর্ন ইসলামের বিভিন্ন কিচ্ছা-কাহিনী এবং নানারঙ্গের ধর্মীয় উপাখ্যান।** বলা বাহুল্য, উপরোল্লিখিত **'কাছাছুল আম্বিয়া'** কিতাবটিই যে মাওলানাদের আসল সম্বল, এতে কোন সন্দেহ নেই। এইসব কুসংস্কারপুর্ন গল্প মাওলানাদের মুখে শুনারপর গ্রাম্য সাধারণ মুসলমানদের মনে অনেক কুসংস্কারপুর্ন কথাই সত্যি বলে বিশ্বাস হয় এবং তাদের মনে সর্বদা কুসংস্কারপুর্ন ভয়ভীতির সৃষ্টি হয় এবং তারা সকলেই একটা অজানা অলৌকিকতার সাগরে সদাসর্বদা ডুবে থাকে। কেহ কেহ আবার এইসব কুসংস্কারপুর্ন কেচ্ছা-কাহিনী শুনে ভক্তিতে গদ গদ হয়ে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কেঁদে বুক ভাষায়।

ছোটবেলা এমনি অনেক ওয়াজ-মাহফিলে গিয়ে মাওলানাদের সুমধুর কণ্ঠে অনেক কুসংস্কারপুর্ন গাজাখুরি গল্প শুনে মাঝে মাঝে চিন্তা হত যে এইসব মাওলানারা কোথায় পায় এত কুসংস্কার। তাদের জ্ঞানের বহর দেখে অবাক হতাম। এখন দেখছি যে ইসলামি কিতাব গুলোতে কুসংস্কারের কোন অভাব নেই মা'শাল্লাহ। উল্লেখিত ঔসব ইসলামী কিতাব থেকেই পাঠকদের জন্য কিছু ইসলামি কুসংস্কারের নমুনা পেশ করছি আমার এই ধারাবাহিক প্রবন্ধে। উল্লেখ্য, এইসব কুসংস্কার ইসলামী কিতাব থেকে হুবুহ বই থেকে তুলে দিচ্ছি এবং ইহাতে আমার নিজের সৃষ্টি কিছুই নেই। তবে মাঝে মাঝে আমার অল্প কিছু রসালো মন্তব্য (*ব্রাকেটের ভিতরে*) থাকবে। আমার এবারকার ইসলামি কুসংস্কারে সিরিজ কিছুদিন ধরে চলবে আশ করি। এবারে আসুন, আমরা খুজে দেখি মুসলিম-আমজনতা কি ধরনের কুসংস্কারে সর্বদা ডুবে থাকে!

(বিঃ দ্রঃ পুর্বের খন্ডে ৩২-৪১ সংখ্যা পর্যন্ত লেখা হয়েছিল)

(৪২) আল্লহ তায়ালা কিভাবে এই পৃথিবী তৈরী করেনঃ

পাঠকগন এবার শুনুন আমাদের পৃথিবী সৃষ্টির আসল রহস্য যাহা উদ্ধার করেছেন আমাদের নবী (সঃ) এবং তার সঙ্গিগন, অবশ্য ইসলামিক বিজ্ঞানের সুত্রের দ্বারা। বিভিন্ন ইসলামি কিতাবের মতে আল্লাহ কর্তৃক পৃথিবী তৈরীর তিন রকমের 'বয়ান' পাওয়া যায়। বয়ান গুলো নিম্নরূপ।

(এক) বিখ্যাত ইসলামি পন্ডিতের বই থেকে জানা যায়, ''আবদুল্লাহ-বিন মাসুদ এবং আরও অন্যান্য নবীজির সঙ্গিদের মতে—''আল্লাহই তৈরী করেছেন এই পৃথিবী এবং আকাশের মধ্যে যা' কিছু আছে। প্রথমে আল্লাহর সিংহাসনটি ছিল পানির উপর; তখনো তিনি অন্য আর কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। তারপর তিনি পানি থেকে ধুয়ার সৃষ্টি করেন। ধুয়া পানির উপরে চলে আসে এবং তাহা অনেক উপরে

উঠে পানির উপরে ছাদের মত হয়ে যায়। আল্লাহ এটাকে ‘হেভেন’ বা আকাশ নাম দেন এবং ইহাদ্বারা সাতটি আসমান তৈরী করেন। তারপর আল্লাহ পানিকে সুকিয়ে দেন যাহা সক্ত হয়ে একটি পৃথিবী তৈরী হয়, যাহা থেকে আল্লহ সাতটি দুনিয়া তৈরী করেন রবি এবং সোম বারে। তারপর আল্লাহ সাতটি দুনিয়াকে স্থাপন করেন একটি বিশাল তিমি মাছের পিঠের উপর যাহা কোরানে বর্ণিত আছে ‘নান’ (Nun) হিসেবে। সেই মাছটি আবার অবস্থান করছে পানির উপর, পানি অবস্থান করছে একটি বিরাট পাথরের উপর, পাথরটি আছে একটি বিশাল ফেরেশ্তার পিঠের উপর, ফেরেশ্ তাটি দাড়িয়ে আছে একটি বিশাল পাথরের উপর, সেই পাথরটি আছে বাতাসের উপর, পৃথিবীর ভাড়ে সেই তিমি মাছটি নড়েচড়ে উঠায় পৃথিবীতে ভুমিকম্প হয় তখন আল্লাহ সেই পৃথিবীতে অনেক পাহাড় স্থাপন করেন যাহাতে এই দুনিয়া আর কখনো ভুমিকম্প না হয়।

(সুত্র– "*The History of Al-Tabari: General Introduction and From the Creation to the Flood*, translated by Franz Rosenthal [State University of New York Press (SUNY), Albany, 1989], Volume 1, pp. 218-220)"

(দুই) দ্বিতীয়টি হল এইরূপ–‘‘আল্লহ যখন মনস্থির করলেন পৃথিবী বানাবার তখন তিনি বাতাসকে হুকুম করলেন সাগরের সকল পানিকে খুব জোড়ে গুটাইতে (**Churn up**) যাহাতে অনেক ফেনার সৃষ্টি হয় এবং সমুদ্রের ঢেউ থেকে ধুয়ার সৃষ্টি হয়। তারপর আল্লহ হুকুম করলেন সমদ্রের ফেনাকে সুকিয়ে শক্ত বস্তূতে পরিনত হইতে। মাত্র দুইদিনে আল্লাহ পানির উপরে সুকনো ভুমি তৈরী করেন, যেমন আল্লাহ কোরানে বলেছেন *(৪১:৯-বল, তোমরা কি অবিশ্বাস কর তার উপর যে দুইদিনে সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবী?)*। তারপর আল্লাহ তায়ালা সমুদ্রের বড় বড় ঢেউগুলিকে হুকুম করলেন স্থির এবং সক্ত হয়ে যেতে যাদেরকে পাহাড় বানিয়ে পৃথিবীতে পেরেকের ন্যায় স্থাপন করলেন যাহাতে পৃথিবী মানুষদের নিয়ে আর কখনো কেপে না উঠে (কোরান-২১:৩১)।

(তিন) তৃতীয়টি হল এইরূপ–আল্লহ পানি থেকে ভুমি (দুনিয়া) বানাবার পর সেটা মানুষদেরকে নিয়ে পানিতে নৌকার মত দুলিতে/কাপিতে লাগিল। তখন আল্লাহ তায়ালা একজন মহাশক্তিশালী ফেরেশ্তাকে পাঠালেন সেই পৃথিবীটি তার কাঁধে নিবার জন্য। সেই বিশালয়কায় ফেরশ্তাটি তার দ’টি হাত পুর্ব এবং পশ্চিম দিকে প্রসারিত করে পৃথিবীটির দুই দিকের শেষ সিমানায় শক্তকরে ধরিল। কিন্তূ, ফেরেশ্তাটির নিচে দাড়ানোর কোন জায়গা না থাকায় আল্লাহ একটি ‘এমার‍্যাল্ড’ পাথর সৃষ্টি করলেন যার মধ্যখানে ছিল সাত হাজার ছিদ্র। একেকটি ছিদ্রতে আছে একটি করে সাগর যার বিবরন কেবল আল্লাহ তায়ালাই দিতে পারেন। আল্লাহ হুকুম করলেন সেই পাথরটিকে ফেরেশ্তাটির পা’এর নিচে স্থির হয়ে থকতে। কিন্তূ, পাথরের নিচে আর কিছু না থাকায়, আল্লাহ সৃষ্টি করিলেন একটি প্রাকান্ড ষাড় যার ছিল চল্লিশ হাজার মাথা, আশি হাজার সিং, চোখ, কান, চল্লিশ হাজার জ্বিব্বা, চল্লিশ হাজার পা । ষাড়টির নাম ছিল–রায়্যান। আল্লাহ ষাড়টিকে হুকুম করলেন

সেই পাথরটিকে তার সিং দিয়ে ধরে রাখতে। কিন্তু সেই ষাড়টির পা রাখার কোন জায়গা না থাকায় আল্লাহ সৃষ্টি করলেন একটি অতিকায় বড় তিমি মাছ যার দিকে কার তাকাবার শক্তি ছিল না কারণ তার আকার ছিল অসামান্য বড় এবং আরও ছিল অসংখ্য চক্ষু। জানা যায় সে সেই তিমি মাছটি এত প্রকান্ড ছিল যে তার কাখ্না (Gills) এর উপর যদি একটি সাগর রাখা হয় তবে তাকে মনে হবে একটি ক্ষুদ্র সড়িষা বীজের ন্যায়। মাছটির নাম ছিল বেহ্মুত। আল্লাহ সেই মাছটিকে হুকুম করিলেন ষাড়টিকে তার পিঠে রাখতে। মাছটি ঠিক তাই করিল। সেই মাছটিকে আল্লাহ স্থাপন করলেন পানিতে। সেই পানির নিচে আছে বাতাস, বাতাসের নিচে আছে অন্দ্ধকার।

সুত্র- (Ibid., translated by Wheeler M. Thackston Jr. [Great Books of the Islamic World, Inc., Distributed by Kazi Publications; Chicago, IL 1997], pp. 8-10;)

(৪৩) অভিশপ্ত নমরুদের জন্ম ও বংশ পরিচয়!

নমরুদ প্রাচীন কালের এক কুখ্যাত বাদশাহ ছিল। দুনিয়ার ইতিহাসে যে সকল শক্তিমান ও ক্ষমতাশালী রাজা-বাদশাহ আল্লাহ রাব্বুল-আলামিনের পরম শত্রু ও চরম অবাধ্য ছিল, নমরুদ তাহাদের অন্যতম। নমরুদের বংশ পরিচয় ছিল এইরূপঃ হযরত নূহ (আঃ) এর অন্যতম পুত্রের নাম ছিল হাম। তাহার বংশধরগন অধিকাংশই হিন্দুস্থানের অধিবাসী ছিল। উহাদের মধ্যে এক ব্যক্তির নাম ছিল আজম। আজমের পুত্রের নাম ছিল কেনান। নমরুদ এই কেনানেরেই পুত্র ছিল। অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে নমরুদের নাম ছিল **কায়কাউস।** কায়কাউসের পিতার নাম ছিল **কায়কোবাদ**। তাহার পিতার নাম ছিল **জামশিদ।**

নমরুদ বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত সাহসী এবং কর্মঠ ছিল। তাই কিছুদিনের মধ্যেই সে প্রধান উজীরের পদ হইতে বাবেলের বাদশাহী পাইয়া বসে। অতঃপর স্বীয় যোগ্যতা বলে সে নিজের ধন-দৌলত এবং প্রভাব-পত্তি অতি মাত্রায় বাড়াইয়া ফেলে। কিছুদিনের মধ্যেই সে স্বীয় বাহুবলে সমগ্র সিরিয়া,তুর্কিস্থান, হিন্দুস্থান, রোম ইত্যাদি রাজ্য দখল করিয়া বা পরাজিত কিংবা ভীত-সন্ত্রস্ত করতঃ তাহাদেরকে কর প্রদানে বাধ্য করে। **নমরুদ সুদীর্ঘ এক হাজার সাতশত বৎসর** আয়ুলাভ করিয়াছিল। এই সুদীর্ঘকাল সে প্রবল প্রতাপের সঙ্গে এক সুবিশাল রাজ্যের শাসনকার্য করিয়া গিয়াছে। এতবড় রাজ্যের অধিকারী হওয়ার কারণে সে খুব বেশী গর্বিত হইয়া পড়িল এবং সে নিজেকে খোদা বলিয়া ঘোষনা করিল। সে এইরূপ ঘোষনা করিল যে, **‘আনা রাব্বুকুমুল আ’লা’** অর্থাৎ আমিই তোমাদের খোদা ও প্রতিপালক।

নমরুদের রাজদরবারে তৎকালীন দুনিয়ার সেরা জ্ঞানী-গুনী এবং বিজ্ঞজনের আনা-গোনা ছিল। একদা নমরুদ স্বীয় পাত্র-মিত্রসহ উপবিষ্ট। এমন সময় রাজকীয়

প্রধান জ্যোতিষী আসিয়া বাদশাহকে অভিবাদন করিল। বাদশাহ তাহাকে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—কি সংবাদ জ্যোতিষী! বাদশাহর প্রশ্নের জবাবে জ্যোতিষী অত্যন্ত চিন্তিত ও বিমর্ষবদনে অস্পষ্ট স্বরে উত্তর দিল-'জাহাপনা সংবাদ তেমন সুভ নহে।' বাদশা জিজ্ঞাসা করিল-কি ঘটনা, খুলিয়া বল। ইহা শুনিয়া জ্যোতিষী বলিল-'কিছুদিন হয় আকাশে একটি নুতুন তারকার উদয় হইয়াছে। তাহা লক্ষ্য করিয়া আমি গনিয়া দেখিলাম তিনদিনের মধ্যে আপনার রাজ্যে একটি শিশু জন্ম নিবে এবং ভবিষ্যতে সেই শিশু আপানার সাথে চরম শত্রুতায় অবতীর্ন হবে এবং সেই হবে আপানার পতনের কারণ। জ্যোতিষীর মুখে এই কথা শুনিয়া নমরুদ বাদশা একাধারে ভীত এবং ক্রোধে গর্জীয়া উঠিয়া সকল রাজ-কর্মচারীদেরকে বলিল— এখনি এই সম্পর্কে সকল ব্যবস্থা করা অতি প্রয়োজন। রাজ্যের সর্বত্র প্রচার করিয়া দাও—আজ থেকে তিনদিন পর্যন্ত কোন স্বামী-স্ত্রী যেন একত্রে বাস না করে এবং কোন অবস্থায় যেন তারা পরস্পর মিলিত না হয়। যদি কেহ এই আদেশ অমান্য করে, তবে তাহার একমাত্র শাস্তি হইবে জীবন দন্ড। নমরুদের এই কঠিন আদেশ শুনিয়া তাহার লাখ লাখ সৈন্য- সামন্ত প্রত্যেক প্রজাদের ঘরে ঘরে প্রকাশ্যে এবং গোপনে পাহারা দিতে লাগিল যাহাতে কোন স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে একত্রে মিলিত হইতে না পারে। অর্থাৎ, প্রত্যেকের শোবার ঘড়ে একটি করে সৈন্য তলোয়ার হাতে দড়িয়ে থাকল।

(৪৪) <u>হয রত ইব্রাহীমের (আঃ) এর জন্মগ্রহন!</u>

আলাহ তায়ালার কুদরত ও মর্জীর বিরদ্ধে কাহার কিছু করার সাধ্য নেই। যেভাবে বা যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে হউক আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তব রূপলাভ করে। নমরুদের কঠোর নির্দেশ যথাযথভাবেই পালিত হইতেছিল। সারা রাজ্যের কোন দম্পতিই তিনদিনের জন্য আর মিলিত হতে পারে নাই। অথচ আল্লাহ তায়ালার যাহা মর্জী ছিল তাহাই অবাধেই ঘটিয়া গেল। নমরুদ বাদশার দেহরক্ষীর নাম ছিল আজর। প্রতিদিন সে রাত জাগিয়া নমরুদের শয়নকক্ষে প্রহরীর কাজে নিযুক্ত থাকিত। আর তাহার স্ত্রী স্বগৃহে একাকিনী রাত্রি কাটাইত এবং যৌন-জালায় ছটপট করিত। যেদিন নমরুদের উল্লেখিত কঠোর ঘোষনা প্রচারিত হইল, সেদিন ঘটনাক্রমে আজরের স্ত্রীর মনে স্বামীর সঙ্গে মিলন বাসনা ভীষন প্রবল হইয়া উঠিল। পক্ষান্তরে নমরুদের শয়ন কক্ষের দরজায় প্রহরী আজর একা বসিয়া কালক্ষেপন করিতেছিল এবং অনুকুল পরিবেশে তার মনেও কামোত্তেজনা দেখা দিল। এদিকে আজরের স্ত্রী রাজমহলের সদর দরজায় পৌছিয়া দেখিতে পাইল যে দরজায় নিয়োজীত প্রহরীদ্বয় বসিয়া নিদ্রায় মগ্ন। অতএব সে সম্পুর্ন বিনা বাধায় অন্দোর মহলে প্রবেশ করিয়া স্বামীর কাছে পৌছিল। আজর তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ঘুমন্ত বাদশাহর পার্শ্ববর্তী কক্ষে স্ত্রীকে লইয়া গিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল। বলাবাহুল্য, আজর দম্পতির এই মিলনেই আল্লাহর নবী হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ) পিতার পৃষ্ঠদেশ হইতে মাতৃগর্ভে স্থানলাভ করিয়াছিলেন। কেহ কিছু জানিল না, বুঝিলনা, টেরও পাইল না। নমরুদের এত সাবধানতা ও সতর্কতা সত্বেও সকলের অলক্ষ্যে আল্লাহ নিজের কাজ সমাধা করিলেন।

তিনদিন অতিবাহিত হবার পর পুর্বোল্লিখিত জ্যোতিষী রাজদরবারে আগমন করতঃ বাদশাহকে বলিল—'জাহাপনা! আপনার এত সাবধানতা এবং সতর্কতা সত্বেও আপানার পরম শত্রু সেই শিশুটি মাতৃগর্ভে আগমন করিয়াছে। বাদশা একথা শুনিয়া ভীতিপ্রদ হইল এবং সে তৎক্ষণাৎ রাজ্যের সর্বত্র ঘোষনা করিয়া দিল—এখন হইতে এক বৎসরের মধ্যে রাজ্যে যত শিশু জন্মলাভ করিবে তাহাদের প্রত্যেককে যেন হত্যা করা হয়। বাদশাহর আদেশে তাহার কর্মচারীগন রাজের সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া যত শিশু খুজিয়া পাইল সবাইকে হত্যা করিল। এভাবে দেশের লক্ষ লক্ষ শিশু আকালে প্রাণ হারাইল। কিন্তূ আল্লাহর অপার মহিমায় আজরের স্ত্রী যে অন্তসত্বা হইয়াছে তাহাও লোকেরা জানিতে পারিলনা, কারণ আজরের স্ত্রীর পেটে কোন শিশুর গর্ভের লক্ষনই প্রকাশ পায় নাই।

নির্দিষ্ট সময়ে আজরের স্ত্রী বহু সাবধানে নিকটস্থ একটি পর্বতগুহায় গমন করিয়া সন্তান প্রসব করিল। একথা সম্পুর্ন গোপন থাকিল। আজরের স্ত্রী তার সন্তানটিকে পর্বতের গুহায়ই রাখিয়া আসিল। তবে আজরের স্ত্রী প্রত্যেকদিন অতি সাবধানে তার সন্তানকে পর্বতের গুহায় দেখিতে আসিত। **আল্লাহর অফুরন্ত মেহেরবানীতে ঔ শিশুর হাতের একটি আঙ্গুল হইতে দুধ এবং আর একটি আঙ্গুল হইতে মধু নির্গত হইত।** শিশুটি তাহায় পান করিয়া লোক চক্ষুরান্তরালেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দিনে দিনে সাতটি বছর অতিবাহিত হইল। এভাবেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বড় হইয়া নমরুদ বাদশাকে ধংস করিয়াছিলেন।

(ইসলামী মোল্লাদের গাঁজার জোঁসের চোটে শিশু ইব্রাহীমের আঙ্গুল থেকে যথাক্রমে 'দুধ এবং মধু' নির্গত হয়! এর পর কাছাছুল আম্বিয়া বইটিতে মোল্লাদের ধর্মীয়-গাঁজার জোসে বহু গাঁজাখোরী গাল-গপ্প ফাঁধা হয়েছে এই নবী ইব্রাহীমের সম্বন্ধে যাহা আমি আর বর্ণনা করিলাম না পাঠকদের ধৈর্য্যচুতি ঘটবে সেই ভয়ে। পাঠকগন বাইবেলে ইব্রাহীম নবীর জন্ম-বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই বুঝতে পারবেন ইসলামী মোল্লারা এই ঘটনাকে কিভাবে কুসংস্কার দিয়ে ভরে ফেলেছে।)

(৪৫) হয রত মুহাম্মাওদ (সাঃ) এর পবিত্র আকৃতি ও অনুপম সৌন্দর্য কেমন ছিল!

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন জন্ম নেন তখন তাঁর শরীর অপবিত্রতা থেকে পাক ছিল। তিনি খতনাকৃত অবস্থায় জন্মলাভ করেন এবং তশরীফ আনা মাত্রই মহান রাব্বুল-আলামীনের সাথে আলাপ করেন। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে—'নূরনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পবিত্র দৈহিক গঠন ছিল মাঝারি ধরনের। অর্থাৎ তিনি বেশী উচু বা বেশী বেটে ছিলেন না। তাঁর পবিত্র শরীরের বর্ণ ছিল উজ্জল গৌর। তাঁর পবিত্র কপাল ছিল প্রসস্ত, ভ্রূদ্বয় ছিল সরু অথচ জোড়া লাগানো না হলেও উভয় ভ্রূ খুব কাছাকাছি ছিল। ভ্রূদ্বয়ের মাঝামাঝি একটি রগ ছিল যাহা নবী (সাঃ) একটু রুষ্ট হলেই সেই পবিত্র রগ চাড়া দিয়ে উঠত। তাঁর পবিত্র নাসিকা ছিল দীর্ঘ ও উচু এবং তার উপর নূর চমকাতো। তাঁর পবিত্র ও মনোরম মুখমন্ডল খুবই সুন্দর ছিল। তাঁর

দাড়ি মোবারক এবং চুলের মাত্র বিশ গোছা চুল সাদা হয়েছিল। তাঁর চুল ছিল কোকরানো। তাঁর পবিত্র কোক রানো চুলের ভাঙ্গন ছিল মাঝারি ধরনের। তাতে নবী করিম (সাঃ) কে খুব সুন্দর দেখাতো। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পবিত্র চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জল ও সুন্দর ছিল। তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে কবুতরের ডিমের ন্যায় একটি মাংসপিন্ড ছিল। তাতে নানা ধরনের নকশা আঁকা ছিল। তা'মোহরে নবীয়াত নামে পরিচিত ছিল। তার ওপর 'মুহাম্মদ রাসুল্লাহ' লেখা ছিল। নবী করিম (সাঃ) এর অন্তর্ধানের পর আল্লাহ পাক সে মোহরে নবীয়াত উঠিয়ে নেন। তাঁর বুক মোবারক প্রসস্ত ছিল। তাঁর বুকের ছাতি থেকে নাভী পর্যন্ত একটি সরু কেশ-রাজি ছিল। তাঁর পবিত্র বাহু, কাঁধ ও বুকে মোলায়েম কেশ ছিল। তার পবিত্র কাঁধ, হাঁটু ও পায়ের গোড়ালির হাড় বড় ছিল এবং উভয় হাতের কব্জি লম্বা ছিল। তার পবিত্র দেহ মোবারক সুঠাম, নূরানী, ভারসাম্যশীল, মাঝারি ধরনের ছিল। তার পবিত্র লালা পানিতে লাগলে ঔ পানি মিঠে হয়ে যেত। **রাতের আঁধারেও তিনি দিনের মত দেখতেন।** কোন শিশু যদি হযরত মুহাম্মাওদ (সাঃ) এর পবিত্র লালা চেটে ফেলত, তবে সারাদিন ঔ শিশুর আর দুধ পান করতে হত না। তার শরীরের ছায়া মোবারক মাটিতে পড়ত না। তার আওয়াজ মোবারক অন্যদের আওয়াজের চেয়ে বেশী হত এবং দুরের লোক তা' শুনতে পেত। সজাগ থাকলে যেরকম শুনতেন তিনি গুমিয়ে থাকলে তেমনি শুনতে পেতেন। তিনি নিরবে বসে থাকলে তাঁর চেহারায় গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেত। দুর থেকে দেখলকে তাকে সজীব দেখাত এবং কাছে থেকে দেখলে তাঁকে সুন্দর, লাবন্য ও মাধুর্য অনুভব করত। তিনি কখনো পানির পিপাসায় কাতর হতেন না। **তিনি সামনে যেমন দেখতেন, তেমনি পেছনেও সেরূপই দেখতেন।** তাঁর সরীর মোবারকে মশা বা মাছি বসতনা। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শরীর মোবারক থেকে সর্বদা মেশক্-আম্বরের খুশবু বের হত। তিনি বাজারে বা কোন স্থানে তশরীফ আনলে তাঁর দেহ সৌরভে মানুষ বুঝতে পারত যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তশরীফ এনেছেন। তিনি প্রকৃতিক প্রয়োজনে তশ রীফ নিয়ে যাবার পর সেখানে **বাহ্য-পেসাবের** কোন চিহ্ন থাকতনা। কারণ মাটি তাহা নিমিষে গ্রাস করে নিত এবং সেখানে **আতর ও লোবানের খুশবু** বের হত। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) চলার পথে একখন্ড মেঘ সর্বদা ছায়া দিত। তিনি রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটতেন, তখন রাস্তার দুপাশের গাছ-পালা মাথা নুইয়ে দিত। হাটার সময় মনে হত, তিনি উচূ স্থান হতে নিচু স্থানে নামছেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মত অপূর্ব সৌন্দর্যের ও প্রকৃতির মানব এ পৃথিবীর মানুষ আর কখনো দেখেনি এবং ভবিষ্যতেও দেখার কোন অবকাশ নেই। আমিন।

(অন্ধ-ভক্তি এবং অন্ধ-বিশ্বাস থেকে মন-মস্তিস্কে জন্ম নেয় অসংখ্য অবাস্তব কুসংস্কারযুক্ত চিন্তা ও কথা। আর তা'দিয়ে দিনে দিনে তৈরী হতে থাকে অসংখ্য অবাস্তব এবং যুক্তিহীন বর্ণনা বা অবাস্তব ঘটনার। অন্ধ ভক্তদের স্তুতি, প্রশংসা, আরাধনা, খোসামোদ, স্তুতি গাইতে গাইতে একজন অতি সামান্য ব্যক্তি বা অতি খারাপ চরিত্রের একজন মানুষকেও উপরে উঠাতে উঠাতে একেবারে ফেরেশ্তাদের সমান করে ফেলে অন্ধ ভক্তরা। এমনকি কাউকে কাউকে স্বয়ং আল্লাহর কাতারে নিয়ে ফেলে। ঠিক এটাই ঘটেছে এই ইসলামের নবী মুহাম্মদের

খুশবু'' আসতে দেখা যায় অথবা, তার (দুরগন্ধময়) থুথুও হয়ে যায় মধুর মত মিষ্টি অথবা মুহাম্মদ রাত্রির ঘন-অন্ধকারেও পরিস্কার দেখতে পেতেন!

এমনটি আমারা দেখতে পাই ইসলামের পীর-দরবেশদের বেলায় ও। ভারত উপমাহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশের পীরদেরকে ঠিক এভাবেই অলৌকিক কাহীনি ফেঁধে স্বাধারণ মানুষ থেকে আলাদা করে একেবারে অনেক উপরে উঠানো হয়ে থাকে। আর এভাবেই সাধারণ মুসলিম আমজনতার মাথা খাওয়া হয় এবং তাদের পকেট লুটপাট করা হয়ে থাকে।)

সুত্রঃ কাছাছুল আম্বিয়া; সৌদী কর্তৃক পবিত্র কোরানের বাংলা অনুবাদ (মাওলানা মহীউদ্দিন খান); পবিত্র কোরানের ইংরেজী অনুবাদ (মাওলানা ইউসুফ আলী); মু'কসেদুল মুমিনিন ; বেহেস্তের জেওর।

(চলবে)